প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
callprasun@gmail.com

অলংকরণ শান্তনু দে

নীলু বাগচীর নথি

পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশনটা পড়তে পড়তে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল পার্থিব। পার্থিব মুখার্জি। পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। গত একবছর ধরে বালুরঘাট কালেক্টরেটে কর্মরত। যার অ্যাপ্লিকেশন, সে সামনেই বসে— ঐন্দ্রিলা বাগচী; পেশায় সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়র, বর্তমানে পুণেতে কর্মরতা। অরিজিন্যালি ফ্রম বালুরঘাট।

—আপনি তৎকালে চাইছেন কেন? অর্ডিন্যারি মোডে অ্যাপ্লাই করলেও তো আজকাল মাসখানেকের বেশি লাগে না। আমাদের একটুআধটু চেনাশোনা আছে পাসপোর্ট অফিসে। বলে দিতে পারি।

কথাগুলো বলার পরই পার্থিব বুঝল— হবে না। এ মেয়ে অত সহজে ম্যাচ ছাড়বে না। একে সুন্দরী, তারপর বুদ্ধিমতী, কাজ আদায় না করে এ যাবে না। তবু যদি কাটিয়ে দেওয়া যায়।

ডিএম সাহেব সেরকমই চাইছেন।

আসলে খাগড়াগড়ের পরে এই তৎকাল পাসপোর্টের জন্য সইসাবুদ করতে অনেক অফিসারই ভয় পান, আবার কিছু কিছু রিকোয়েস্টে সরাসরি না করাও যায় না।

এটা সেরকমই একটা কেস।

ঐন্দ্রিলাকে রেফার করেছিলেন রাজ্যের এক প্রাক্তন মন্ত্রী, যিনি ওদের পুরনো বাড়ির কাছাকাছিই থাকেন। প্রাক্তন হলেও গুরুত্বপূর্ণ, তাই সরাসরি না বলতে পারেননি জেলাশাসক।

পার্থিবর উপর নির্দেশ, অ্যাপ্লিকেশনটা খুঁটিয়ে পড়ো। একটু লোকাল থানার সঙ্গে কথা বলে ইনফর্ম্যালি জেনে নাও কোনও পুলিশ রেকর্ড আছে কি না, আর পারলে বুঝিয়ে নিরস্ত করো। বরং পাসপোর্ট অফিসে বলে-টলে একটু তাড়াতাড়ি করিয়ে দেওয়া যাবে।

অগত্যা পার্থিবর কপালে এই সুন্দরী।

ঐন্দ্রিলা বাগচী, বছর ২২-২৩, ফর্সা, স্লিম আর আকর্ষণীয়। পুরুষকে বোল্ড করার ইয়র্কারটা দিতে জানে।

মাথার পিছন দিকে দুটো হাত তুলে আলগা করে বাঁধা খোঁপাটাকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল ঐন্দ্রিলা। আসলে নরম সাদা হাত দুটোকে একটু ফোকাসে আনল— ইয়র্কার নম্বর এক।

পার্থিব প্রায় আউট! 'ইয়ে মানে— আপনি যদি ইনসিস্ট করেন, তাহলে অন্য কথা, নাহলে...'

—মিস্টার মুখার্জি... ঐন্দ্রিলা এবার দ্বিতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করল— সাদা ধবধবে মুক্তোর মতো দাঁতের হাসি, 'আমাকে সামনের মাসেই কোম্পানি থেকে বিদেশ পাঠানোর একটা জোরালো সম্ভাবনা আছে। এর মধ্যে আসতেও পারব না—প্লিজ...'

মিডল স্ট্যাম্প চলে গেল পার্থিবর! 'ঠিক আছে, ঠিক আছে... আমি ডিএম স্যরকে বলে করিয়ে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি।'

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যর। একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে চা খেতে, আমি আছি আরও কয়েক দিন।

ঐন্দ্রিলা এবার বোনাস দিচ্ছে।

পার্থিব বুঝল, জার্মান ফুটবল দলের থেকেও বেশি অঙ্ক করে খেলে এই মেয়েটা, একেবারে স্টেপ বাই স্টেপ। প্রথমে কেজো কথা, তারপর অন্তরঙ্গতার মসৃণ হাতছানি। পার্থিব আউট! প্যাভিলিয়নে ফিরছে।

—আপনাদের বাড়িটা কোন দিকটায়? ছোট শহর, চিনে নেওয়া শক্ত নয়।

—বাড়ি নয় ফ্ল্যাট। ঐন্দ্রিলার সংশোধনী। প্রযুক্তিবিদের স্বাভাবিক প্রবণতা: বর্ণনায় নির্ভুল থাকা।

পরের দিন সন্ধে ৭টা নাগাদ পৌঁছে গেল পার্থিব। ঐন্দ্রিলাদের ফ্ল্যাটটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি। ছোট শহরে এই একটা সুবিধা।

—বাড়ি ছিল এটা, এখন ফ্ল্যাট। ও আপনাকে বলা হয়নি, বাড়িটা আমরা কিছুদিন আগে বিক্রি করে দিয়েছি। শম্ভু আগরওয়ালকে চেনেন তো? ও-ই প্রোমোটিং করেছে। পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট নিয়ে আছি এখন। এই আর কী।

বিজয়বাবু, মানে ঐন্দ্রিলার বাবা, একটা ছোট ব্যাখ্যা দিলেন বাড়ি থেকে ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়ার।

এই পরিবর্তনটা এখন জেলাশহরগুলোতে খুব চোখে পড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজ, আর বাইরের লোকও আসছে। মধ্যবিত্ত মানুষগুলো বাড়ির মায়া কাটিয়ে ফ্ল্যাটে সরে যাচ্ছে। আরও কিছুদিন পর হয়তো একটা ছোট শহরে মাত্র কয়েকটাই বাড়ি থাকবে। টুরিজম অ্যাট্রাকশন হিসাবে।

শহরের প্রখ্যাত আইনজীবী নীলাব্জ বাগচী মারা যাওয়ার পর তাঁর তিন ছেলের মধ্যে সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়। বাকি দুই ভাই কলকাতায় সেটেল্‌ড। তাই বিজয় বাগচী মোটামুটি একাই ভোগ করছিলেন বাবার সম্পত্তি। পরে সিদ্ধান্ত হয় বাড়ি বিক্রির।

—আপনার বাবার কথা শুনেছি। আজও কোর্ট চত্বরে কান পাতলে ওঁর নাম শোনা যায়। একচেটিয়া প্র্যাকটিস ছিল বলে শুনেছি ওঁর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবা সিভিলে শুরু ক'রে পরে ক্রিমিনালে সুইচওভার করেন। টানা ১৫ বছর পাবলিক প্রসিকিউটরও ছিলেন অবিভক্ত দিনাজপুরের।

দিনাজপুর। পশ্চিমবঙ্গের সম্ভবত সবচেয়ে না-জানা অচর্চিত ইতিহাসের আকর। লোকজন উত্তরবঙ্গ বলতেই বোঝে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার আর দার্জিলিং। মাঝের এই তিনটি জেলা— মালদা, উত্তর আর দক্ষিণ দিনাজপুর একটু অনুচ্চারিতই থেকে যায়।

'৪৭-এর দেশভাগের পর দিনাজপুর দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব দিনাজপুর যা শুধুই দিনাজপুর বলে পরিচিত, তা চলে যায় পাকিস্তানে, অধুনা বাংলাদেশে, আর পশ্চিম দিনাজপুর পড়ে এদেশের মধ্যে।

১৯৯২ সালে দু'ভাগে ভাগ করা হয় পশ্চিম দিনাজপুরকে। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় জেলা বিভাজন। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে দু'-টুকরো হয়ে যাওয়া পশ্চিম দিনাজপুরের দক্ষিণ অংশ পরিচিত হয় দক্ষিণ দিনাজপুর হিসাবে— যার জেলা সদর হয় আত্রেয়ীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা মায়াবি বালুরঘাট, আর উত্তর দিনাজপুরের জেলা সদর হয় রায়গঞ্জ।

সেই অবিভক্ত দিনাজপুরেরই পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন নীলাব্জ বাগচী। ছ'ফুটের উপর লম্বা, শালপ্রাংশু নীলাব্জর মধ্যে কোথাও একটা রাজসিক ব্যাপার ছিল— যা আজকের গড়পড়তা উকিলদের মধ্যে আর দেখাই যায় না।

—কফিতে চিনি চলবে তো?

লং স্কার্ট আর টপে ঐন্দ্রিলাকে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে।

—ও ইয়েস। একটু কম। পার্থিব একটু অন্যমনস্ক।

বইয়ের তাকে বেশ কিছু পুরনো বই, কয়েকটা দুষ্প্রাপ্যও। এমিল গ্যাবোরিও থেকে ফলি নরিম্যান। বেশ রেঞ্জ আছে এই সংগ্রহের।

—আমার দাদুর। পার্থিবর মনোযোগ নজর এড়ায়নি ঐন্দ্রিলার, 'দাদু বই পড়তে ভালবাসতেন। আরও ছিল। সব এদিক-ওদিক হয়ে গেছে।' একটু বিষণ্ণ লাগল মিস ঐন্দ্রিলা বাগচীকে। 'বাড়ি ভেঙে যখন ফ্ল্যাট বানানো শুরু হয়, তখন কয়েক মাসের জন্য আমরা অন্য একটা ফ্ল্যাটে শিফ্‌ট করি। তখনই কত বই এদিক-ওদিক হয়ে যায়।'

পার্থিব এটা শুনেছিল অন্য একটা আড্ডায়, নীলাব্জ বাগচীর বইয়ের অসাধারণ সংগ্রহ আর ধরে রাখতে পারেননি তাঁর ছেলেরা। কিছু আছে, কিছু লোককে এমনিই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিলো দরে বেচে দিয়েছে বাগচী পরিবার।

এটা খুব কষ্টের জায়গা পার্থিবর। শহর যখন বড় হয় তখন বাড়ি বদলে যায়। কেউ কদর করে না স্মৃতির, ঐতিহ্যের। প্রয়োজনের নির্মম বাস্তব ছুড়ে ফেলে দেয় কত কিছু। বই, চিঠি, প্রেম, স্মৃতি— সব ফেলে দিতে হয় বড় হওয়ার দাম দিতে।

দু'কাপ কফির পর উঠতে ইচ্ছে না করলেও উঠতেই হল পার্থিবকে। ঐন্দ্রিলা নামক নেশার হাত থেকে মুক্তির জন্য। এ মেয়ে জ্বালাবে।

—কিপ ইন টাচ।

আগে শেষ ইয়র্কারটাও দিয়ে দিয়েছে মিস ঐন্দ্রিলা বাগচী, আর ততক্ষণে হোয়াট্‌সঅ্যাপে হাই পাঠিয়ে দিয়েছে পার্থিব।

—অফকোর্স। পার্থিবর বালুরঘাটে কাটানো সেরা বিকেল।

প্রেমকুমার আগরওয়ালকে লোকে 'গুলিয়াদা' বলেই জানে, পুরনো জিনিসের একটা অসাধারণ সংগ্রহশালা আছে ওঁর। বালুরঘাট শহরে গুলিয়াদা একটা চরিত্র। গুলিয়াদার সঙ্গে ওর আলাপ করায় মিউজিয়ামের কিউরেটর অর্ক। একদিন মিউজিয়ামে একটা সেন যুগের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি মন দিয়ে দেখছিল পার্থিব। অর্ক বোঝাচ্ছিল যে, পাল যুগের মূর্তিগুলোর থেকে সেন আমলের মূর্তিগুলো অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। কথার ফাঁকে চা খেতে খেতে বলেছিল, 'স্যর, আপনার পুরনো জিনিসে এত আগ্রহ, আমি আপনাকে একদিন একটা প্রাইভেট মিউজিয়ামে নিয়ে যাব। এই শহরেই।' অর্কর সঙ্গেই প্রথম গিয়েছিল গুলিয়াদার বাড়ি।

১০০ বছর আগের হ্যারিকেন থেকে ভেঙে যাওয়া জাহাজের মাস্তুল— সব আছে গুলিয়াদার সংগ্রহে। সিনেমার টিকিট, নাট্যমন্দিরের প্রথম রশিদ, তিতীর্থের নাটকের টিকিট— একটা ইতিহাসকে বাড়িতে রেখে দিয়েছেন গুলিয়াদা।

নীলাব্জ বাগচীর কয়েকটা বই আর ফেলে দেওয়া কিছু কাগজ গুলিয়াদার কাছেও ছিল— কোনওটা সামান্য দামে কেনা, কোনওটা ফোকটে পাওয়া। কয়েক বছর আগে একটা প্রখ্যাত বাংলা দৈনিকে বেরিয়েছিল এই সংগ্রহশালার কথা। পেপার কাটিংটা সযত্নে রেখে দিয়েছেন গুলিয়াদা।

পরের দিন উত্তরবঙ্গ উৎসবে হাইস্কুল মাঠে দেখা বার-এর প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট শেখর সেনের সঙ্গে। 'বার' বলতেই পানশালা বোঝার যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে বাঙালির তা একদিন লজ্জায় ফেলেছিল পার্থিবকে। নতুন জয়েন করে শহরে বেরিয়েছে, এটা-ওটা দেখছে। সঙ্গে পীযূষ— জুনিয়র, কিন্তু এখানে বছর দুয়েক আছে। ল' ব্যাকগ্রাউন্ড থাকার জন্য, যেখানেই যাক, কোর্টের আর ল'ইয়ারদের সঙ্গে একটা সখ্য গড়ে ওঠে পার্থিবর। 'এখানে বার কীরকম?' প্রশ্নটা প্রায় লুফে নিল পীযূষ, 'স্যর ছোট শহর— বার নেই, বাড়িতে এনে খেতে পারেন।' "আরে না না, আমি ল'ইয়ার্স বারের কথা বলছিলাম।" অপ্রস্তুত পার্থিব কোনওরকমে ম্যানেজ করল।

একথা-সেকথার পর পার্থিব তুলল নীলাব্জবাবুর কথা। ঐন্দ্রিলাটা উহ্য রেখে।

—একটা দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ ছিল নীলুদার— Priceless। অপদার্থ ছেলেগুলো তো আর মর্ম বুঝল না বাপের সংগ্রহের!

বক্তা শেখর সেন।

—একটা দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ? কিন্তু কী?

ক্লাসিকের পরিশীলিত ধোঁয়ায় হাসলেন শেখর যেন। "থাক সে কথা। লেট্‌'স ডিসকাস সামথিং এল্‌স।"

পরের দিন ঐন্দ্রিলাকে জিজ্ঞেস করল। ও জানে না। "দাদুর কোন খুব মূল্যবান সংগ্রহ? দেখুন ল' বই বা জার্নালের একটা নিজস্ব দাম তো আছেই— তবে তা বলার মতো না। না না আই অ্যাম নট অ্যাওয়ার মিস্টার মুখার্জি।' হাসল ঐন্দ্রিলা। মোনালিসা থেকে ঐন্দ্রিলা— হাসলে মেয়েদের খুব রহস্যময় দেখায়। বিজ্ঞান এই পৃথিবীর প্রায় সব রহস্যেরই উত্তর খুঁজে পেয়েছে— শুধু পারেনি 'নারী' নামক রহস্যের উদঘাটন করতে।

ব্যাপারটা মাথা থেকে যাচ্ছিল না। একটা দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ— কী সেটা? কোথায় গেল? জেনেশুনেই কি চেপে গেলেন মি. শেখর সেন? আর ঐন্দ্রিলা? না, ঠিক বলছে না। সিক্সথ সেনস বলছে পার্থিবর।

অনেক চেষ্টা করেও কিছু বেরল না। বিকেলে গুলিয়াদার বাড়িতে হাজির পার্থিব। সোজা ফায়ার করল। 'নীলু বাগচীর কালেকশনের ওই বিশেষ সংগ্রহটা কাউকে দেখান না কেন?' আন্দাজে ঢিল মারল। লেগেও গেল।

চোখটা স্থির হয়ে গেল প্রেমকুমার আগারওয়ালের, "সাহেব, আপনি এখানে চাকরি করতে এসেছেন । দু'দিন পর চলে যাবেন। আমরা থাকব, এ ব্যাপারটা আপনি ভুলে যান।"

ভয় গুলিয়াদার চোখে-মুখে।

—কিন্তু কেন? কী এমন জিনিস? চুরি-ডাকাতির ভয় করছেন না কি?

—না। সংগ্রাহকের চোয়াল শক্ত। তার চেয়েও অনেক খারাপ কিছু হতে পারে সাহেব। ওটা একটা কেসের রায়। অনেক পুরনো।

—মানে? একটা কয়েকশো বছরের পুরনো আইনি নথি, যার হয়তো আজ কানাকড়িও দাম নেই, সেটা দেখাতে এত ভয়?

—ওটা মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির রায়ের কপি।

গুলিয়াদার চোখ স্থির।

—নন্দকুমারের! মানে? পার্থিব হাতড়াচ্ছে।

—হ্যাঁ। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির রায়। জাজ ইলিইজা ইম্পের দেওয়া। সেই রায়ের কপি ছিল নীলাব্জবাবুর কাছে, কখনও কাউকে বলতেন না। দেখাতেনও না, শুধু বিপ্রদীপ জানত, ও নীলুদার চেম্বার জুনিয়র ছিল। নীলুদা মারা যাওয়ার পর ওটা ও হস্তগত করে। কিন্তু ভুলটা করে কয়েকজনকে দেখিয়ে। আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে। কয়েক দিন পর গলায় দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে বিপ্র, মানে বিপ্রদীপ। কারণ বোঝা যায়নি।

—তো সেটা আপনি পেলেন কী করে?

—সাহেব ওটা অশুভ, ওতে একটা আত্মার কান্না লুকিয়ে আছে, একটা মানুষ, যাকে বিচারব্যবস্থাই ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলেছিল, তার কান্না, মহারাজা নন্দকুমারের।

গুলিয়াদা স্পষ্টত পাওয়ার ইতিহাসটা বলতে রাজি নয়। প্রসঙ্গ এড়াচ্ছে। দেখাতে চায়নি গুলিয়াদা, পার্থিবও নাছোড়বান্দা, 'ফালতু কুসংস্কার, দেখান না একবার।'

—কাল আসুন একটু ভেবে দেখি।

গুলিয়াদা ঘুরিয়ে যেতে বলছে।

—ওকে, ঠিক আছে, কাল এই সময়।

রাতে অশ্বিন সাংভি-র 'দ্য রোজাবল লাইন' বইটা পড়ছিল পার্থিব। 'অপাস দেই'-এর উপর ড্যান ব্রাউনের 'দ্য ভিঞ্চি কোড' পড়ার পর থেকে এই ধরনের বইগুলো পড়ার প্যাশনটা এসেছে। রহস্যময় সংগঠন, মিথ আর একটা গা ছমছমে ইতিহাস। কিন্তু বেশিক্ষণ পড়তে ভাল লাগল না। মহারাজা নন্দকুমার এমনভাবে মাথায় ঢুকেছে যে অন্য কিছুতে মনসংযোগ করতেই পারছে না! গুগল করল। 'দ্য ট্রায়াল অফ মহারাজা নন্দকুমার'। আজকাল এই এক সুবিধা। বিনে পয়সায় অন্যের রিসার্চ করা জিনিসটা সহজেই পাওয়া যায় হাতের কাছে। যা পেল সেটা বেশ ইন্টারেস্টিং।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৬৪ থেকে '৭৫-এর মধ্যে। 'মহারাজা' গোছের উপাধি থাকলেও আদতে এই নন্দকুমার ছিলেন একজন ট্যাক্স কালেক্টর, যাদের সেই সময় 'দিওয়ান' বা 'দেয়ান' বলা হত। ১৭৬৪ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের জায়গায় নন্দকুমারকে বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলি জেলার ট্যাক্স কালেকশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। হেস্টিংস ভার্সাস নন্দকুমার কাহিনির সেটাই শুরু।

ঝামেলাটা আবার নতুন চেহারা নিল ১৭৭৩-এর দিক, যখন ওয়ারেন হেস্টিংসকে ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সির গভর্নর করা হয়। নন্দকুমারই হেস্টিংসের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আনেন আর সেই অভিযোগ স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসের নেতৃত্বাধীন বাংলার সুপ্রিম কাউন্সিল গ্রহণও করেছিল।

কিন্তু হেস্টিংস ছিলেন তুখড় প্রশাসক। ঠিক কেটে বেরিয়ে গেলেন। সুপ্রিম কাউন্সিলও হেস্টিংসকে তেমন কিছু করতে পারল না। নন্দকুমারের শেষের শুরুটা হল এখানেই। এত আস্পর্ধা! হেস্টিংস শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওই ক্রিকেটে বলে না, টাইমিং খুব ইম্পর্ট্যান্ট— বলটা আগে খেললেও উঠে যাবে, পরে খেললেও স্ট্যাম্প নিয়ে যাবে। টাইমিং হলে মাঠের বাইরে যাবে। এমনিতে হেস্টিংসের জীবনটা খুব বর্ণময়, ওঁর মা ছোটবেলায় মারা যান। ওয়ারেন ওয়েস্ট মিনিস্টার স্কুলে সহপাঠী হিসাবে পান ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী লর্ড শেলবার্ন, ডিউক অফ পোর্টল্যান্ড এবং বিখ্যাত কবি কাউপার-কে। কেরিয়ারের শুরুটা একদম ভাল হয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্লার্কের চাকরি নিয়ে জাহাজে চেপে বসা ছেলেটা সত্যিই জানত না যে সে একদিন গভর্নর জেনারেল হবে। কপাল। ১৭৫৭-এর পর ক্লাইভের খুব নেকনজরে আসেন হেস্টিংস আর ক্লাইভ তাঁকে মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট কমিশনার বানিয়ে দেন।

হেস্টিংসের সঙ্গে মিরজাফরের নাকি একটা অদ্ভুত ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়। কিছুদিন পর বিভিন্ন কারণে চাকরিবাকরি ছেড়ে ইংল্যান্ডে ফিরেও গিয়েছিলেন। কিন্তু পয়সা ফুরিয়ে যেতেই আবার চাকরি নিয়ে ভারতে। সেই সময় কোম্পানির ডিরেক্টর লরেন্স সুলিভান নাকি একদম দেখতে পারতেন না হেস্টিংসকে! কিন্তু সেই ক্লাইভ। হিন্দি ছবির কিছু ফ্লপ নায়ক যেমন গডফাদার ধরে ঠিক টিকে যায় ইন্ডাস্ট্রিতে, হেস্টিংসও তাই। ওঁর গডফাদার ছিলেন ক্লাইভ। আর চাকরি আবার এই পোড়ার দেশে। লোকে বলে, ১৭৬৯ সালে জাহাজে করে আসার সময় এক জার্মান ব্যারোনেসের প্রেমে পড়েন ওয়ারেন এবং জাহাজে ওঁর কর্তা থাকা সত্ত্বেও প্রেমটা আটকাতে পারেননি। অসম্ভব ভাল খেলোয়াড় ছিলেন; জলে বা জমিতে— পার্থিবর মূল্যায়ন। যাই হোক, প্রথমে ক্লাইভের বদান্যতায় ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সির গভর্নর হলেন। কিছুদিন পরে ক্যালকাটা, মাদ্রাজ আর বোম্বে তিনটেই পকেটে পুরলেন আর হয়ে গেলেন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল।

আচ্ছা, এঁর সঙ্গে নন্দ পারে?

নন্দকে ঝোলাতে বেশি সময় নেননি হেস্টিংস। ভারতের প্রথম চিফ জাস্টিস ইলিইজা ইম্পে ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু। নন্দকে দোষী সাব্যস্ত করা হল তছরুপের মামলায়।

৫ আগস্ট ১৭৭৫-এ নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হল। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ফাঁসি আর ভারতের একমাত্র 'জুডিশিয়াল মার্ডার' বলা হয় এই কুখ্যাত বিচারকে। রিটায়ারমেন্টের পরে এর জন্য হেস্টিংস আর ইম্পের ইম্পিচমেন্টও হয়েছিল। টানা সাত বছর ধরে চলা সেই মামলা নাকি ১৪৮ দিন হাউস অফ কমন্‌সে বসেছিল। প্রসিকিউশনের পক্ষে এডয়ার্ড বার্ক তৈরি ছিলেন হেস্টিংসকে জেলে ঢোকাতে, কারণ তাঁর বন্ধু ফিলিপ ফ্রান্সিসকে একবার নাকি হেস্টিংস ডুয়েলে আহত করেছিলেন! কিন্তু আবার হারা ম্যাচ বের করে নিয়ে গেলেন হেস্টিংস— উলটে পেলেন ৪০০০ পাউন্ড স্টারলিং ক্ষতিপূরণ!

পড়তে পড়তে পার্থিব ভাবছিল নন্দকুমারের কথা। এ এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একদিকে তৎকালীন ভারতের অন্যতম ক্ষমতাশালী এবং হিংস্র মানুষ— যে তার পছন্দের নারীকে জিতে নেবে আর অপছন্দের পুরুষকে সরিয়ে দেবে, তার মুখোমুখি এক অসহায় বঙ্গসন্তান। দিনের পর দিন বিচারের নামে প্রহসন দেখা আর নিজের মৃত্যুর প্রহর গোনা— এটাই বোধহয় ডেস্টিনি ছিল নন্দকুমারের। ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়! সেই বিচার! তার রায়ের কপি! যাতে একটা মানুষকে তিল তিল করে হত্যা করার প্রক্রিয়াকে আইনি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সত্যিই এক অভিশপ্ত দলিল।

পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল পার্থিব। সকালে ঘুমটা ভাঙল একটু দেরিতে, সাত-আটটা মিস্‌ড কল, থানার ওসির, রিং ব্যাক করল পার্থিব, 'হ্যাঁ বড়বাবু, বলুন।'

—স্যর, কালকে কি আপনি গুলিয়াদার ওখানে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো? এনি প্রবলেম?

—স্যর, আমি আসছি আপনার ওখানে। সাক্ষাতে বলব, এখন পোস্টমর্টেমের জন্য বডিটা পাঠাতে হবে।

পার্থিব কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ফোনটা রেখে দিল।

তবে কি গুলিয়াদাও?

পার্থিব কিছু ভাবতে পারছে না।

'মহারাজা' উপাধি থাকলেও আদতে নন্দকুমার ছিলেন একজন ট্যাক্স কালেক্টর, যাদের সেই সময় 'দিওয়ান' বা 'দেয়ান' বলা হত। ১৭৬৪ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের জায়গায় নন্দকুমারকে বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলি জেলার ট্যাক্স কালেকশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। হেস্টিংস ভার্সাস নন্দকুমার কাহিনির সেটাই শুরু।